বড়ুয়া বৌদ্ধদের আদিকথা
ও
বর্তমান প্রেক্ষাপট

গ্রন্থকার
বোধিমিত্র বড়ুয়া (শিক্ষক)

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Prajna Dipti Bhante

বড়ুয়া বৌদ্ধদের আদিকথা
ও
বর্তমান প্রেক্ষাপট

গ্রন্থকার

বোধিমিত্র বড়ুয়া (শিক্ষক) বি.এ.এল. এল. বি. সূত্র ও অভিধর্ম বিশারদ।

সিনিয়র শিক্ষক ঃ কক্সবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়।

উৎসর্গঃ

পিতা ঃ মৃত অধীন চন্দ্র বড়ুয়া

মাতা ঃ মৃত ধীরা বালা বড়ুয়া।

প্রকাশকালঃ

৫ই মার্চ ২০১০ ইং।

গ্রন্থসত্ত্বঃ

কুশলায়ন প্রকাশনা পরিষদ।

কম্পিউটার কম্পোজঃ

শ্রী জ্যোতিঃপ্রিয় ভিক্ষু,

পুরাতন রুমখাঁ ত্রিরত্ন বিহার, উখিয়া।

সার্বিক সহযোগীতায়ঃ

শ্রী জ্যোতিঃরক্ষিত ভিক্ষু, শৈলেরঢেবা চন্দ্রোদয় বিহার, উখিয়া।

সহযোগীতায়ঃ

প্রসূন মিত্র বড়ুয়া,

সৌমিত্র বড়ুয়া,

বিশ্বমিত্র বড়ুয়া, কক্বাজার।

প্রকাশনায়ঃ

কুশলায়ন প্রকাশনা পরিষদ।

শৈলেরঢেবা, উখিয়া, কক্সবাজার।

[illegible] মূল্য-১৫ টাকা

প্রাসংগিক কিছু কথা

ইতিহাস একটি জাতির দর্পণ। ইতিহাস দর্পনের মতো জানিয়ে দেয় অতীত ঐতিহ্য সংস্কৃতির ভাল-মন্দের স্মৃতি। যেখানে থাকতে পারে সুখ আবার দুঃখও। সুখের হোক আর দুঃখেরই হোক আমাদের অতীতের এসব ঘটনা প্রবাহ নিয়েই আমাদের ইতিহাস। বর্তমান আর ভবিষ্যৎ রূপরেখা উৎসারিত হয় ইতিহাসের পাতা থেকে। অর্থাৎ অতীতের ভূল-ভ্রান্তি আমাদের ভবিষ্যৎ বিশুদ্ধতার পথ দেখায়। যে জাতি যতবেশী ইতিহাস প্রেমি ও ওয়াকি বহাল সে জাতি ততবেশী আত্মনির্ভরশীল ও আত্মমর্যাদা রক্ষায় সচেতন। কারণ অতীত শৌর্য বীর্য, ঐতিহ্য-সংস্কৃতি তথা পুরাকীর্তি সম্পর্কে জানতে সক্ষম হয় এবং নিজেকে সেভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হারিয়ে যাওয়া সেই হৃত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠায় আত্মপ্রত্যয়ী হয়। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে আমাদের বড়ুয়া উপাধিধারীদের মধ্যে ইতিহাস চর্চা নেই বললে অতুক্তি হয় না। গুটি কয়েক সচেতন ব্যক্তিত্ব যাঁরা এ সম্পর্কে অধ্যয়ন ও গবেষনা করে বিচ্ছিন্ন ভাবে বড়ুয়া জাতির ইতিহাস লিখেছেন তাও সীমাবদ্ধ একটি গন্ডির মধ্যে আটকে আছে। যা এখনো আমাদের সাধারণ জনগণ এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুব সমাজ মোটেই ওয়াকিবহাল নয়, এ নিয়ে আরও গবেষণামূলক তথ্য নির্ভর জাতীয় ইতিহাস সমাজের সর্বস্তরের সাধারণ জনগণের তথা উদীয়মান শিশু-কিশোর ও যুবকদের মাঝে প্রকাশ ও প্রচারণার ব্যবস্থা করা উচিত। ক্ষুদ্র অথচ অত্যন্ত তথ্য-উপাত্তে সমৃদ্ধ বাবু বোধিমিত্র বড়ুয়ার এ প্রয়াস সত্যিই প্রশংসনীয় এবং যুগোপযোগী। তিনি একজন প্রতিথযশা শিক্ষক এবং বৌদ্ধ ধর্ম ও সমাজ নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর এ উদ্দ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি। ইতিপূর্বে তাঁর বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। তিনি প্রাথমিক বৌদ্ধ ধর্মীয় বিষয়ের উপর একটি বইও লিখেছেন।

এককালের শৌর্য-বীর্য বৈশালির বৃজি জাতি, যে জাতিকে স্বয়ং বুদ্ধ প্রশংসা করেছিলেন এবং তিনি তাঁদের সর্ম্পকে বলতে গিয়ে ভিক্ষু সংঘকে বলেছিলেন, ভিক্ষুগণ! তোমরা যদি দেবলোকের দেবপুত্র দর্শন না করে থাক, তবে বৈশালীর এই বৃজি জাতিকে দেখ। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সেই জাতি দৈহিক গঠন তথা রূপ-লাবণ্যে কত সমৃদ্ধ ছিল। শুধু তা নয়, বুদ্ধ এক সময় মগধরাজ অজাতশত্রুর প্রধান মন্ত্রি বর্ষাকার ব্রাম্মণের উপরক্ষে বলেছিলেন-আনন্দ। যদ্দিন বৈশালীর বৃজিগণ নিম্নোক্ত সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মে প্রতিষ্ঠিত-সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন পৃথিবীতে এমন কোন জাতি বা শক্তি নেই, সেই বৃজিগণকে পরাজিত অথবা ধ্বংস করতে পারে।

সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম হচ্ছেঃ

১. যারা সভা-সমিতিতে সর্বদা একতি হয়।

২. সর্বদা একতাবদ্ধ ভাবে একত্রিত হয়, সভার শেষে সকলে এক সঙ্গেই চলে যায় এবং সভায় প্রস্তাবিত কাজ একযোগে সম্পাদন করে।

৩. যারা দেশে ও সমাজে কুনীতির প্রর্বত্তন করে না, পূর্বের নির্দ্ধারিত সুনীতির উচ্ছেদ সাধন করে না এবং প্রাচীন সুনীতি যথাযথ ভাবে মেনে চলে।

৪. যারা বৃদ্ধগণকে সৎকার, গৌরব, সম্মান ও পূজা করে এবং তাদের বাক্য শ্রবণ ও গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করে।

৫. যারা কোন কুল-স্ত্রী বা কুল কুমারীদের সতীত্ব নষ্ট করে না। বরং ধর্ম দ্বারা নারীদেরকে স্বাধীনতা প্রদান করে।

৬. গ্রাম-মধ্যে ও বহিপ্রদেশে যেসব চৈত্য আছে, যারা সেই চৈত্য সমূহের সৎকার, গৌরব, সম্মান ও পূজা করে এবং সে চৈত্য সমূহে পূর্ব প্রচলিত ধর্মতঃ দান-কর্ম ও পূজার পরিহানি করে না।

৭. যারা অর্হৎ শীলবানদের ধর্মতঃ রক্ষা করে, পালন করে, তাদের সুখ সুবিধার সুব্যবস্থা করে এবং দেশে যে অর্হৎগণ আসেন নাই, তাঁরা কি প্রকারে দেশে আসবে, উপস্থিত অর্হৎগণ দেশে নিরাপদে বাস করছেন কিনা, সর্বদা এসব অনুসন্ধান করে, তাদের শ্রীবৃদ্ধি হয়ে থাকে, পরিহানি হয় না।

উপরোক্ত গুণাধার জাতির উত্তরসুরী হিসেসে ইতিহাসবেত্তাদের ধারনায় সমৃদ্ধ বড়ুয়ারা। যে জাতি ২৫০০ বছরের পূর্বে পৃথিবীতে গণরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে গণতান্ত্রিক ভাবে রাষ্ট্রপরিচালনা করে গণতন্ত্রের রূপ-রেখা সৃষ্টি করেছিলেন, সে জাতিই বংশ-পরম্পরা বড়ুয়া জাতি। তাই যেমন গর্বের, তেমন গৌরবেরও বটে।

সবশেষে বলা যায়, ইতিহাস একটি জাতির ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যকে যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করে। সমাজ ও জাতির অগ্রগতির কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছতে ইতিহাসের জ্ঞান সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। ইতিহাস পাঠে চেতনাবোধ জাগ্রত করে মানুষকে অনুপ্রাণীত করে। তাই আত্মপরিচয়ের সংকটের লগ্নে ইতিহাস পাঠ আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। ইতিহাসের জ্ঞান আমাদের গর্বিত করে তুলতে পারে অতীত ঐতিহ্যের প্রতি এবং এর ফলে আমরা জাতীয় ইতিহাস ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার প্রত্যাশায় উদ্ভাসিত হতে পারি।

শ্রী কুশলায়ন ভিক্ষু
প্রধান পরিচালক
জ্ঞানসেন ভিক্ষু-শ্রামণ প্রশিক্ষণ ও সাধনা কেন্দ্র,
শৈলেরঢেবা, উখিয়া।

বড়ুয়া বৌদ্ধদের আদিকথা ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

প্রারম্ভিক বক্তব্যঃ

মানব সৃষ্টির আদি কথায় বৌদ্ধ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা হচ্ছে সংবর্ত্ত কল্পের সময় ব্রম্মলোক হতে চ্যুত হয়ে ঔপপাতিক রূপে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণকারী বা পৃথিবীর প্রথম মানব হচ্ছেন "বোধিসত্ত্ব"। বোধিসত্ত্বের অপর শাস্ত্রীয় নাম 'মনু'। কাল-পরিক্রমায় এ মনুই পৃথিবীর প্রথম "মহাসামন্ত রাজা। ক্রমে লক্ষ কোটি বছর পেরিয়ে বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারক-বাহক হয়ে মানব বর্তমান এসেছে। গুহা হতে 'নদীতীরে এবং ক্রমে শহর-বন্দরে মানুষের বসবাস শুরু হয়। বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মত 'ভারতীয় উপমহাদেশ তথা জম্বুদ্বীপে ও সিন্ধু সভ্যতা, আর্য্য সভ্যতা, দ্রাবিড় সভ্যতা বিভিন্ন নদী তীরে ঘিরে' গড়ে উঠে। কাল পরিক্রমায় ও ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ তথা চিন্তা ধারার প্রতিফলন শুরু হয়। বিশেষ করে সিন্ধু সভ্যতার পরে আর্য্য জনগোষ্ঠী বলে পরিচিত সভ্যতার আমলে এ সংস্কৃতি চর্চা প্রসার লাভ করে। এ আর্য্যরা মধ্য এশিয়া, রাশিয়া, হাঙ্গেরী, অষ্ট্রিয়া তথা উত্তরমেরু হতে ক্রমে উত্তর-পশ্চিম গিরিপথে এদেশে এসে নব সভ্যতার সূচনা করেছিল বলে জানা যায়। তারা এখানে ক্রমে বঙ্গ, রাঢ়, সমতট তথা বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী প্রাচীন অনার্যদের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়। এ আর্য্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন জাতি সত্ত্বা ছিল। বিশেষ করে মঙ্গোলীয় ও প্রটোঅষ্ট্রেলিয় জাতিসত্ত্বার লোকজন অন্যতম। প্রাচীন ইতিহাসে এদেশের আর্য্যপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে অষ্ট্রিক ভাষাভাষি নিষাদ গোষ্ঠী এবং আলপাইন জনগোষ্ঠী বলা হয়। চাকমা, মারমা, মুরুং, খুই, রাখাইন, প্রভৃতি লোকজন মঙ্গোলীয় এবং প্রাচীন গাঁও, সাওতাল, হোইতাল, সমতাল, তালাও প্রভৃতি জনগোষ্ঠী প্রোটে অষ্ট্রেলিয় এবং আদি বসবাসকারী অধিকাংশ লোকজন দ্রাবিড়ীয় বাঙ্গালী ওরাও, হাদং মাঙ্গাই ইত্যাদি রূপে ক্রমে পরিচিত লাভ করে।

জনগোষ্ঠীর সাথে এ আর্য্য জনগোষ্ঠীর মিশ্রণে ক্রমে শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ লাভ করে এবং জম্বুদ্বীপে বিভিন্ন ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটে। নানা মুনি, ঋষির দার্শনিক চেতনায় যাগ-যজ্ঞ-বলি প্রথা এবং সমাজে শ্রেণীভেদ সৃষ্টি হয়। ক্রমে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও বংশের নামে ভারতে ১৬ টি জনপদের সৃষ্টি হয়। তিন হাজারাধিক বর্ষ পূর্ব থেকে শাক্য বংশ, কোলিয় বংশ, বৃজি বংশ, মল্ল বংশ, দেবদহ শাক্য তথা বিভিন্ন রাজবংশের সূচনা হয়। আড়াই হাজারাধিক বর্ষ পূর্বে এ উপমহাদেশে ছয় তীর্থংকরের ৬২ প্রকার মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন ধর্মীয় মতবাদ প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বেদ-বেদান্ত তথা ষড়দর্শনে ভারতবাসী শ্রেণী বৈষম্যে যখন হাবুডাবু খাচ্ছিল তখন বিশ্বে সম্পূর্ণ এক নতুন মতবাদ ও সাম্যনীতি নিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তি রচিত হয়। মৈত্রীমন্ত্রে জনগণ আশ্রয় নিয়ে বুদ্ধের

অভিনব মুক্তিমার্গের অনুসারী হন। এ অনুসারীদের মধ্যে বর্তমান বড়ুয়া বৌদ্ধদের পূর্ব পুরুষও ছিলেন। তবে 'বড়ুয়া' নামে কোন উপাধী তখন ছিল না। পরবর্তীতে বিভিন্ন ঘটনা পরিক্রমায় প্রাচীন প্রকৃতি গোঁড়া বৌদ্ধরাই 'বড়ুয়া' উপাধী ধারী হন। কিভাবে এ কখন প্রাচীন বৌদ্ধরা 'বড়ুয়া' উপাধী লাভ করেছেন এবং কারা এ 'বড়ুয়া' বৌদ্ধ তা পর্যালোচনা করাই এ প্রবন্ধের মূখ্য উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক, গবেষক এবং বাঙ্গালী বৌদ্ধরা এ প্রবন্ধের দ্বারা কিছুটা উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

প্রাচীন ঐতিহাসিক ও লেখকগণের দৃষ্টিতে বড়ুয়াঃ

প্রাচীন ইতিহাস দলিল, দস্তাবেজ, বিভিন্ন লোক, পন্ডিত ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন হতে জানা যায়, আর্য্য পরবর্তী তথা বেদ-বেদান্ত দর্শনের পর বৌদ্ধ ধর্মের সূচনা হলে ভারতবর্ষের অধিকাংশ এলাকার লোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। বর্তমান 'বড়ুয়া' বংশের পূর্ব পুরুষগণ ও তখন বিভিন্ন গোত্র ও উপাধী নিয়ে বসবাস করতেন। তাই অনেক লেখক ও ঐতিহাসিকগণের অভিমত বর্তমান বড়ুয়া বৌদ্ধরাই প্রাচীন বাংলার আদি অধিবাসী। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ বাবু সুনীতি রঞ্জন বড়ুয়া তাঁর 'বড়ুয়া জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "বাঙ্গালী বৌদ্ধরাই এদেশের আদি বংশধর এবং বাঙ্গালী বৌদ্ধগণকে এদেশের দেশজ ও ভূমিজ সন্তান বলা যায়।" 'চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক ও গবেষক এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বাবু নতুন চন্দ্র বড়ুয়া তাঁর পুস্তকের ৩৫ পৃঃ লিখেছেন, "মগধ সামরাজ্যের অন্তর্গত বৈশালীর বৃজি বংশীয় এক ক্ষত্রিয় রাজপুত্র বহুসংখ্যক অনুচরসহ মগধ হতে পালিয়ে ক্রমে আসাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম তথা বিভিন্ন স্তানে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। এ সময়টা সম্ভবত দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতক। মগধের এ 'বৃজি' শব্দ পরবর্তী অপভ্রংশ শব্দ হয় 'বড়ুয়া'। আসামের বড়ুয়াগণ কালের পরিক্রমায় ধর্মান্তরিত হলেও 'বড়ুয়া' উপাধী ত্যাগ করেননি।" কেননা, তাঁরা 'বড়ুয়া' শব্দ অর্থে সম্মান বা উৎকৃষ্ট মনে করতেন।" বিশিষ্ট বৌদ্ধ দার্শনিক ও পন্ডিত সর্বজন শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাথেরো ভন্তে তাঁর 'সদ্ধর্মের পুনরুত্থান' ও তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে ও পুস্তকেও লিখেছেন, 'বৃজি' শব্দের অপভ্রংশ হচ্ছে 'বড়ুয়া'। পন্ডিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ১৮৯৪ সালের চৈত্র সংখ্যায় লিখেছেন, "দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের দিকে বৌদ্ধরা অত্যাচারিত হয়ে আরকান রাজার আশ্রয় লাভার্থে চট্টগ্রামের দিকে চলে আসেন এবং আরকান রাজার আশ্রয়ে স্বধর্ম রক্ষা করতে সমর্থ হন।" চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ আবদুল করিম লিখেছেন, "চট্টগ্রামের বড়ুয়ারা এ দেশের আদি জনগোষ্ঠী। শিক্ষা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে বড়ুয়াই অগ্রগামী ছিলেন।" এছাড়াও বিশিষ্ট পণ্ডিত ও সমাজ সংস্কার প্রয়াত উকিল উমেশ চন্দ্র মুৎসুদ্ধি তাঁর 'বড়ুয়া জাতি' গ্রন্থে বড়ুয়াদের প্রাচীন

ইতিহাস ও 'বড়ুয়া' শব্দের তত্ত্ব নিয়ে অনেক মূল্যবান তত্ত্ব লিখেছেন। তিনি পন্ডিত ধর্মাধার ভন্তের সাথে একই মত পোষণ করেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বাবু সুনীতি রঞ্জন বড়ুয়া 'বাংলাদেশের বড়ুয়া জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য' গ্রন্থের ৭ পৃষ্ঠায় আরো লিখেছেন "বড়ুয়াগণ এ দেশের আর্য্য পূর্ব জাতির বংশধর। পেশাগত ও কর্মক্ষেত্রের কারণে ব্যক্তি বিশেষের উপাধী চৌধুরী, তালুকদার, সিকদার, মুৎসুদ্দি, হাজারী হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে এরূপ উপাধী প্রাপ্তদের পরিবারে ঐ সমস্ত উপাধী বংশ পরম্পরায় চলে এসেছে।

বিশিষ্ট লেখক ও চিন্তাবিদ বাবু সুনীতি রঞ্জন বড়ুয়া তাঁর গ্রন্থে আরো লিখেছেন, "বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক মগধ দখল হলে বৃজি বংশীয় রাজপুত্র ৭০০ মত জ্ঞাতীসহ চট্টগ্রামের দিকে চলে আসেন- এ কথা গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা, শিলা লিপি, তাম্র লিপি, ভুজ্যপত্র দ্বারা ইহার প্রমাণ নেই। কিংবদন্তী মাত্র।" (বাংলদেশের বড়ুয়া জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য পৃঃ ১৭)।

প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ প্রণব কুমার বড়ুয়া তাঁর লিখিত "বাংলাদেশের বৌদ্ধ সাহিত্য, ঐতিহ্য ও সমাজ জীবন গ্রন্থের পরিশিষ্ঠের ৯৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "বৌদ্ধরাই আদিযুগের বাঙ্গালী। শতাব্দীকালের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠী বর্তমানে এক ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে।"

কোন কোন ঐতিহাসিক ও গবেষক মনে করেন। "বুদ্ধ সদ্ধর্ম প্রচারার্থে বাংলাদেশে ও এসেছিলেন। ডঃ প্রণব বাবু তাঁর পরিশিষ্ঠের ৯৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। "বুদ্ধ পুন্ডবর্ধনের তৎকালীন এক শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ সুমগাধারের প্রার্থনায় ৫০০ শিষ্যসহ পুন্ডবর্ধনে এসেছিলেন। এছাড়া, একাদশ শতকের কাশ্মীরে কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁর বিরচিত 'বোধিসত্ত্বাবদান কল্পতা' গ্রন্থে ও উপরের বক্তব্য সমর্থন করেছেন। চৈনিক পরিব্রাজকগণের কাহিনীতে ও বুদ্ধ বঙ্গদেশে এসেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁরা লিখেছেন, বুদ্ধ পুন্ডবর্ধন অর্থাৎ বগুড়া, মহাস্থানগড় এবং সমতট তথা দক্ষিণ পূর্ব বাংলাদেশে এসে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। আরকান রাজাদের ইতিহাস গ্রন্থ "রাজোয়াং" এ উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধ সশিষ্য বার্মায় এসেছিলেন। বার্মা হতে ক্রমে হস্তীগ্রাম, আম্রগ্রাম ও চন্দ্রনাথে এসেছিলেন। এ হস্তীগ্রাম ও চন্দ্রনাথ দু'ঠোই চট্টগ্রামে অবস্থিত। সুতরাং, একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীনকাল হতেই এখানে বৌদ্ধ ছিলেন এবং বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের চর্চা হত। এছাড়া সম্রাট অশোকের আমলে ও বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল বলে জানা যায়। এদেশে প্রাপ্ত অশোক স্তম্ভই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাঙ্গালী বৌদ্ধদের নিয়ে অতীতে আবুরখীলের ডাঃ রাম চন্দ্র বড়ুয়া "চট্টগ্রামের মগের ইতিহাস" গ্রন্থে ও বড়ুয়াদের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে লিখেছেন। কুমিল্লায় সিংহ

উপাধীধারী অনেক বাঙ্গালী বৌদ্ধ আছেন। ইতিহাস পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সিংহ উপাধী বৌদ্ধগণ প্রাচীন বংগ রাজা সিংহ বাহুর বংশধর। রাজা সিংহ বাহুর সন্তান বিজয় সিংহ পরবর্তীতে বর্তমান সিংহলে গিয়ে সিংহল জয় করে রাজত্ব করেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্ত্তক গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণ বর্ষে খ্রীঃ পূর্ব ৪৮০ অব্দে এ সিংহল রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলে সিংহলে ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে। বর্তমান সিংহল বাসীর আকৃতি ও রং প্রায় বাঙ্গালীর মত। তাদের নামের সাথেও সিংহ, সিনহা ইত্যাদি উপাধী এখনো দেখা যায়। তেমনি বর্তমান কুমিল্লা অঞ্চলে প্রাচীন বৌদ্ধগণের মধ্যে এ সিংহ উপাধী রয়ে গেছে।

'বড়ুয়া' উপাধীর কথাঃ

ক্রমে ক্রমে প্রাচীন বাঙ্গালী বৌদ্ধগণের সাথে 'বড়ুয়া' উপাধীযুক্ত হয়েছে। কখন কিভাবে যুক্ত হয়েছে এবং উপাধী কারা দিয়েছেন ক্রমে তা পর্যালোচনা করা হল। অনেকে মনে করেন 'বড়ুয়া উপাধী' আসলে প্রাচীনকালের শৌর্য্য বীর্য্যের প্রতীক এবং প্রাচীন রাজবংশের উপাধী। বর্তমান কাল হতে প্রায় তিন-চারশ বছর আগে থেকে এ উপাধী প্রচলিত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

আভিধানিক অর্থেঃ

বড় ধাতুর সাথে 'উয়া' প্রত্যয় যোগে 'বড়ুয়া' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। বিশ্ব কোষ অভিধানের আখ্যায়িকায় 'বড়ুয়া' অর্থে প্রতিভাবান বৌদ্ধ রাজবংশের কথা বলা হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় 'বটুক' শব্দের অর্থ করা হয়েছে বড়ুয়া বা শ্রেষ্ঠ। উপমহাদেশের প্রখ্যাত বৌদ্ধ গবেষক সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডঃ বেণী মাধব বড়ুয়া ১৯৩৮ সালে লিখিত তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন, "বৃজি" বা বজ্জি শব্দ থেকে 'বড়ুয়া' শব্দটি এসেছে। বৃজি বা বৃজ্জিরা শব্দ থেকে ক্রমে বড়ুয়া শব্দটির উৎপত্তি বলে তিনি মনে করেন। প্রাচীন বৈশালীয় লোকজনই 'বৃজি' বা বজ্জী বলা হত।

তৎকালীন বরেন্দ্র এলেকার অধিবাসীগণকে আর্য্য ধর্মের অনুসারী বলে খুবই সম্মান করা হত বলে জানা যায়। সমাজে তাঁরা সমাদর ও সম্মানের পাত্র ছিলেন বলে বরণীয় এবং ক্রমে এ বরণীয় থেকে 'বরেন্দ্র' নামকরণ হয় বলে অনেকে মনে করেন। তাছাড়া ক্রমে বরণীয় বা বরেন্দ্র 'বড়ুয়া' শব্দে রূপান্তিরত হয় বলে মনে করা হয়। ক্রমে ঐ বরেন্দ্র এলেকায় লোকজন চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী তথা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। 'বগুড়া' শব্দটি 'বড়ুয়া' শব্দের অপভ্রংশ হতে পারে। বর্তমান লালমাইয়ের কাছের স্থান বরুরা বা বড়ুয়া থানা বিদ্যমান।

প্রাচীনকালে 'বড়ুয়া' শব্দটি সর্ব্বোচ্চ ভাবে ব্যবহার করা হত বলে অনেক পণ্ডিত অভিমত দিয়েছেন। "চট্টগ্রামের প্রথম মানব ভূমি" গ্রন্থের লেখক ও ঐতিহাসিক আলাদীন আলী তাঁর পুস্তকের ১২ পৃষ্ঠায় লিখেছিলেন, "বর ভূমিই বড়ুয়া জাতির

আদিবাস ভূমি" তিনি এ বরভূমি বলতে সমুদ্র হতে উচু ভূমিকে বুঝিয়েছেন। এ উচু ভূমি হচ্ছে চট্টগ্রাম এবং এ চট্ট ভূমি হচ্ছে চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রামে আদি বসবাসকারী হচ্ছেন বড়ুয়ারা বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

প্রাচীন ক্ষত্রিয় প্রভাবঃ

প্রাচীন ক্ষত্রিয় বংশের আচার কৃষ্টির প্রভাব প্রাচীনকালে চট্টগ্রামে বসবাসী জনগণের মধ্যে ছিল। তখনকার দিনে সমাজে শ্বশুরকে সম্মান স্বরূপ ডাকা হত 'বড় উগ্যা' এবং শ্বাশুড়ীকে "আযোঁয়া" বা আর্যমা ডাকা হত। এটা বহুবৎসর ব্যাপী সমাজে সম্মান অর্থে প্রচলিত ছিল। এমনকি আমরা ছোটকাল এ বা আযোঁয়া ডাকতে শুনেছি। এ বড় উগ্যা হতেও ক্রমে বড়ুয়া শব্দটি আসতে পারে। কেননা, আগেই লিখেছি যে, বড়ুয়া অর্থে প্রাচীনকালে সম্মানিত মনে করা হত। একথা গুলো সদ্ধর্ম রত্নমালা এবং বড়ুয়া জাতি' গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

আর্য্য ও ম্রাম্মাগ্রী অর্থে 'বড়ুয়া'ঃ

গৌতম বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত সম্যকধর্মের অপর নাম 'আর্য্য ধর্ম।' এখানে আর্য্য বলতে প্রকৃত সদ্ধর্ম্মের অনুসারী বা কুশল ধর্মের আচরণকারীকে বুঝানো হয়েছে। বড়ুয়াগণের পূর্ব পুরুষ এবং বর্তমান বড়ুয়া উপাধীগণ বুদ্ধের ধর্মের অনুসারী বা আর্য্যধর্মের পূজারী বলে বড়ুয়াদেরকে 'বর অরিয়া' বা বড় আর্য্য নামে সম্মান করা হত। বড়ুয়াগণ মগধাগত কিংবা লিচ্ছবী বংশ জাত বুদ্ধের ধর্মপ্রচার স্থান থেকে এদেশে এসেছেন বলে চট্টগ্রামের আরকান শাসকেরা এবং এ স্থানে বসবাসকারী রাখাইনরা বড়ুয়াগণকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে আশ্রয় প্রদান করেন। রাখাইনরা বড়ুয়াগণকে "মাম্রাগ্রী" বলে সম্মান সূচক শব্দে ডাকতেন। এ ম্রামাগ্রী শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, "ম্রাম্মা" মানে ব্রহ্মবাসী এবং ওয়াগ্রী মানে বড়। অর্থাৎ ব্রহ্মবাসীর চেয়ে মগধাগতগণ বড়। কারণ, তাঁরা বুদ্ধের ধর্মপ্রচার স্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে এসেছেন। এ 'মাম্রাগ্রী' শব্দ হতে 'বড়ুয়া' শব্দের উৎপর্ত্তি হতে পারে বলে অনেক গবেষক মত প্রকাশ করেছেন।

কবির দৃষ্টিতে 'বড়ুয়া'ঃ

প্রাচীন অনেক কবিও রাজন্যবর্গ নামের সাথে 'বড়ুয়া' শব্দ ব্যবহার করতে গর্ববোধ করতেন বলে জানা যায়। যেমন, ১৪ শতকের কবি বড়ু চন্ডীদাস তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থে বড়ুয়া শব্দটির অর্থ করেছেন 'শ্রেষ্ঠ'। তিনি তাঁর গ্রন্থের 'পনের দশ শতাব্দীর পদাবলীল' ৩১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

একে তুমি কুলনারী, কুলে আছে তোমার বৈরী,
আর আছে বড়ুয়ার বধু।

কবি নিজ নামের আগে 'বড়' অর্থে 'বড়ু' চন্ডীদাস ব্যবহার করেছেন বলে গবেষকরা

মনে করেন। কবি 'বড়ু' ব্যবহারে নিজেকে সম্মানিত বোধ করতেন বলে গবেষকগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

প্রাচীন রাজাদের 'বড়ুয়া' পদবীঃ

প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় ত্রিপুরার রাজা অমর মানিক্য 'বড়ুয়া' উপাধী নিয়ে ১৫৭৭ ইং ১৫৮৬ ইংরেজী পর্যন্ত ত্রিপুরায় রাজত্ব করেছেন। তৎকালীন রাজারা 'বড়ুয়া' উপাধী নিয়ে রাজত্ব করতে গর্ববোধ করতেন বলে জানা যায়। ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণেতা কালী প্রসন্ন সেন তাঁর 'রাজ মালায়' (১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দ) লিখেছেন,

"বিজয় মানিক্য রাজার জমিদার আমি,
সে রাজার 'বড়ুয়া হৈয়া রাজা হৈলা তুমি।"

রাজার এ উপাধী ব্যবহার করায় ক্রমে এ রাজার তথা স্থানীয় অধিবাসীগণ বড়ুয়া উপাধী গ্রহণে উৎসাহিত বোধ করতেন বলে মনে হয়। প্রখ্যাত লেখক মিঃ হান্টার ১৮৯১ সালে সম্পাদিত "Statiscal Account of Bengal" গ্রন্থে লিখেছেন, "বড়ুয়াগণ মূলত রাজবংশী।'

প্রাচীন বৌদ্ধ রাজাগণঃ

বাংলার প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা দেখা যায় খ্রীষ্টপূর্ব ৫৪৩ হতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত এ দেশের শাসক ছিলেন প্রাচীন সিংহ উপাধীধারী বংশের রাজারা। খ্রীঃ প্রথম শতাব্দীর পর হতে খ্রীঃ ৭২৫ খ্রীঃ পর্যন্ত খড়গ বংশের লোকেরা বাংলার শাসক ছিলেন। খড়গ বংশের রাজত্বকালে প্রখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিহারে অবস্থান করেন এবং তখনকার পরিবেশ নিয়ে অনেক ইতিহাস লিখেছিলেন। পরবর্তীতে পাল বংশের উত্থান ঘটে। এ বংশের রাজারাও বৌদ্ধ ছিলেন এবং এ আমলকে বৌদ্ধ ধর্মের স্বর্ণযুগ বলা যায়। বিশেষ করে বরেন্দ্র এলেকায় তথা বর্তমান পশ্চিম বাংলায় পাল সময়ের শাসকদের প্রভুত প্রভাব ছিল। দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় ৬ষ্ঠ থেকে ১১ শতক পর্যন্ত সিংহবর্ম, খড়গ, ভদ্র, দেব, চন্দ্র বংশীয় রাজারা রাজত্ব করেন। সমতট তথা কুমিল্লা অঞ্চলের শাসক ছিলেন চন্দ্র বংশীয় রাজারা। এ বংশের রাজাগণ খ্রীষ্টীয় ৯০০ শতক থেকে ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সমতটে রাজত্ব করেছিলেন। এ সময়ে চন্দ্র বংশীয় রাজা ছিলেন পূর্ণ চন্দ্র, সূবর্ণ চন্দ্র, ত্রৈলোক্য চন্দ্র, শ্রী চন্দ্র, ময়নামতী, কল্যাণ চন্দ্র, লগুহা চন্দ্র, গোবিন্দ চন্দ্র প্রমুখ রাজারা।

চন্দ্র বংশীয় রাজত্বের পর দেব বংশীয় রাজাগণ ১০৫০ খ্রীঃ হতে ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সমতটের রাজা ছিলেন বলে জানা যায়। এ সময়ের রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন পুরুষোত্তম দেব, মধুসুদন দেব, বাসুদেব, আনন্দ দেব, দামোদর দেব, কান্তি দেব প্রমুখ। তাঁদের মধ্যে রাজা কান্তি দেব রাজধানী স্থানান্তর করে দেব পর্বতে রাজত্ব

করেছিলেন বলে অনেক গবেষক মনে করেন। বর্তমান চট্টগ্রামের দেব পাহাড়ই ছিল সম্ভবত কান্তি দেবের রাজধানী। যেখানে বর্তমানে নতুন বৌদ্ধ বিহার গড়ে উঠেছে। চন্দ্র বংশীয় রাজা মানিক চন্দ্র 'বড়ুয়া' উপাধী ব্যবহার করতেন বলে কোন কোন গবেষক মনে করেন। তিনি কুমিল্লায় কোটবাড়ীতে রাজত্ব করতেন। তার স্ত্রীর নাম ছিল ময়নামতি। তাদের আত্মীয় স্বজন কুমিল্লার বরুরা অঞ্চলে বসবাস করেছেন বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। এ কারণে পরবর্তীতে বরুয়া নাম হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ রাজার রাজত্বঃ

কালের পরিক্রমায় সমতট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিভিন্ন বৌদ্ধ রাজার আর্বিভাব ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায়। তাঁদেরকে সামন্ত বা অঞ্চল ভিত্তিক আঞ্চলিক রাজাও বলা হয়। এ সামন্ত রাজাগণ ছিলেন বাঙ্গালী এবং বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। তাদের সে সময় যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল বলে জানা যায়। এ প্রাচীন আঞ্চলিক রাজাদের মধ্যে রাজা মনি ভদ্র, রাজা রাখাই, রাজা জয় চন্দ্র, রাজা মুকুট রায় প্রমুখ অন্যতম। অনেকের রাজত্ব সন ও সময় কাল সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে কয়েকজন রাজার রাজত্বকাল সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

রাজা মনিভদ্র ও রাজা খ্রীষ্টীয় ১২ শতক থেকে খ্রীষ্টীয় ১৩ শতক পর্যন্ত চট্টগ্রামে রাজত্ব করে রাজত্ব করেছিলেন। রাজা জয়চন্দ্র ১৪৮২-১৫৩০ পর্যন্ত বর্তমান পটিয়ায় চক্রশালার সামন্ত রাজা ছিলেন বলে জানা যায়। এছাড়া রাজা মুকুট রায় ১৬৩১-১৬৬৬ পর্যন্ত আনোয়ারার দেয়াং পাহাড়ে রাজত্ব করেছিলেন বলে বিভিন্ন গবেষকগণ মত প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে চট্টগ্রামের ইতিহাস ও পটিয়ার ঐতিহ্য গ্রন্থে এ সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য রয়েছে।

নিম্নে প্রাচীন বৌদ্ধ রাজ বংশের চিত্র প্রদত্ত হলঃ

১. সিংহ বংশ খ্রীঃ পূর্ব ঃ ৫৪৩-১ম শতক পর্যন্ত।

২. বর্ম বংশ খ্রীষ্টীয় ২য়-৫ম (কোট বাড়ী জাত বর্মা, হরি বর্মা, ভোজ বর্মা (মহাযানী)।

৩. শাল বংশ-কুমিল্লার শালবন এলেকা।

৪. খড়গ বংশ ৬২৫-৭২৫ কুমিল্লা। খড়গদ্যোম জাত খড়গ, দেব খড়গ, প্রমুখ রাজন্য বর্গ।

৫. পাল বংশ ৭৫০-১১৭৫। গোপাল, ধর্মপাল, দেবপাল, রাজ্য পাল, বিগ্রহপাল (প্রায় ৪০০ বছর)।

৬. চন্দ্র বংশ ৯০০-১০৫০ (রোহিত গিরি) (কুমিল্লা লালমাই) সূবর্ণ চন্দ্র, পূর্ণ চন্দ্র,

ত্রৈলোক্যচন্দ্র প্রমুখ রাজাগণ (প্রায় ১৫০ বছর)।

৭. দেব বংশ ১০৫০-১২৭৯। পুরুষোত্তম দেব, মধুদেব, আনন্দ দেব, দামোদর দেব প্রমুখ রাজাগণ।

রাজ কার্য্যে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে বিবিধ উপাধী প্রদানঃ

১৬৬৬ সালে বাংলায় নবাব শায়েস্তা খান দ্বারা আরকান রাজা যুদ্ধে পরাজিত হলে এ দেশে বসবাসকারী বড়ুয়াগণ লোকজনের সাথে ও বিভিন্ন রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। এ সময়ে কাজের মান অনুসারে নিযুক্ত কর্মচারীগণকে সম্মান বিভিন্ন উপাধী প্রদান করা হয়। যেমনঃ

১। ষ্টেটের ম্যানেজারের উপাধী ছিলঃ মুচ্ছদ্দী।

২। ভূমিকর বা খাজনা আদায়কারীর উপাধী ছিলঃ তালুকদার।

৩। তরফে বিভক্ত বা জমির ভাগ অনুযায়ী দায়িত্ব প্রাপ্তকে দেয়া হয়- জমিদার বা তরফদার।

৪। এ তরফদার উপাধীধারীর অন্য নাম ছিল- চৌধুরী বা ভুইয়াঁ।

৫। সামরিক বিভাগে দায়িত্ববানের উপাধী ছিল- সিকদার বা সর্দার।

৬। হাজারী- ১০০০ সেনার দায়িত্ব প্রাপ্তদেরকে হাজারী উপাধী প্রদান করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, এ সমস্ত উপাধী বড়ুয়া, মুসলমান, হিন্দু, রাখাইনদের মধ্যেও ছিল এবং এখনও বিদ্যমান আছে। কাজের শ্রেণী ভেদে এ সমস্ত উপাধী প্রদান করা হয়েছিল।

পূর্ববর্তী বংশধরদের অনুকরণঃ

চট্টগ্রামের আদি বৌদ্ধগণ সমতটের প্রাচীন বৌদ্ধদের বংশধর বলে পরবর্তীতে বড়ুয়াগণ তদানীন্তন রাজাদের নামের সাথে মিল রেখে নাম রাখতেন বলে মনে করা হয়। 'কান্তি' বংশের রাজার অনুকরণে বড়ুয়ারা তাই তাদের নামের সাথে 'কান্তি' ব্যবহার শুরু করেন। দেব কান্তি, বিমল কান্তি, লক্ষী কান্তি, অনিল কান্তি বড়ুয়া। চন্দ্র বংশীয় রাজারা এদেশে রাজত্ব করেছেন। তাই 'বড়ুয়াগণ' ও তাদের নামের সাথে 'চন্দ্র' ব্যবহার শুরু করেন। রাজা মানিক চন্দ্রের অনুকরণে বড়ুয়াগণ পরবর্তীতে নামের সাথে চন্দ্র যোগ করেন। যেমন-বিমল চন্দ্র বড়ুয়া, অধীন চন্দ্র বড়ুয়া, অনিল চন্দ্র বড়ুয়া, বাদল চন্দ্র বড়ুয়া, রাখাল চন্দ্র বড়ুয়া। এ চন্দ্র বংশীয় পণ্ডিত অতীশ দীপংকর বিক্রমপুরের অধিবাসী। তাঁর পিতার নাম 'কল্যাণ শ্রী'। পাল রাজারা রাজত্বকালে নামের শেষে 'পাল' শব্দটি ব্যবহার করতেন। যেমন ধর্মপাল, দেব পাল। তেমনি বড়ুয়াদের মধ্যেও দেবপাল বড়ুয়া, লেকপাল বড়ুয়া প্রচলন হয়।

এভাবে দেখা যায় যে, বিভিন্ন বৌদ্ধ রাজ বংশের উপাধীর প্রভাব বর্তমান বড়ুয়াদের মধ্যে পড়েছিল। তাই বড়ুয়াগণ প্রাচীন রাজ বংশের বংশধর বলে চিন্তাবিদগণ মনে করেন।

বড়ুয়াদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীঃ

বিভিন্ন সময়ে বড়ুয়াদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী নামকরণ ছিল। গোত্র বা গোষ্ঠীর মধ্যে রাখাইন নামের স্পষ্ট প্রভাব বড়ুয়া সমাজে পড়েছিল। নিম্নে কয়েকটি প্রাচীন 'বড়ুয়া' গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করা হলঃ

বড়ুয়াগণ এখানে বসবাসকালে ক্রমে বিভিন্ন গোষ্ঠী নামে পরিচিত লাভ করে। যেমন- বড়ুয়া চোমড়া গোষ্ঠী, বড়ুয়া রাউচ্ছী গোষ্ঠী, বড়ুয়া রাজ গোষ্ঠী, রাউলীয় গোষ্ঠী, কুরারাম গোষ্ঠী, বড়ুয়া বাহু গোষ্ঠী ইত্যাদি। এছাড়াও মুলাইং, ছিদাই, হাছাগ্রী, আন্নাদ্ধা, ফুঙ্গী, লেবাইং, মিমাগ্রী, লুলাম্ব, কামাংশু, কারঞ্চ, ধুৎসাং, হোয়াসং, কৈলাংগ্রী, রোয়াজা, কেজ, রাস্বত প্রভৃতি রাখাইন প্রভাবে প্রাচীন বড়ুয়াগণ গোষ্ঠী পরিচয় দিতেন। এছাড়া ও কর্মের দ্বারাও গোষ্ঠীর নামকরণ হত। বর্তমানেও তা লক্ষ্য করা যায়। নাম রাখার ক্ষেত্রে ও রাখাইন প্রভাব লক্ষণীয়। যেমন, চাতপ্রু বড়ুয়া, অন্তপ্রু বড়ুয়া, ক্যজপ্রু বড়ুয়া ইত্যাদি।

প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবঃ

বৌদ্ধদের ক্রান্তিকাল ছিল খ্রীষ্টীয় ৯ম-১০ শতাব্দীর পর থেকে প্রায় পাঁচ ছয়শত বৎসর পর্যন্ত। এ সময় ধর্মীয় পুস্তক ও সঠিক বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অভাবে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অভাবে বৌদ্ধ সমাজ ক্রমে বিভিন্ন পূজা অর্চনার দিকে ঝুঁকে পড়ে। হিন্দু সংস্কৃতির সাথে বৌদ্ধ সংস্কৃতি প্রায় একাকার হয়ে যায়। ক্রমে বড়ুয়া সমাজে শনি পূজা, লক্ষী পূজা, কার্ত্তিক পূজা, স্বরসতী পূজা, সত্যপাঠ পূজা, শিবগাছ তোলা, আশ্বিনী, শীতলা পূজা, মানত, সিন্নি ইত্যাদি পূজা-অর্চণার প্রভাব পড়ে। 'মারে মগিনীর মগ' রাজার ঝিরে'- ডাক দিয়ে মগধেশ্বরী পূজা করা হত। যদিও মা মগধেশ্বরী বৌদ্ধ ছিলেন। তান্ত্রিক দেবী বলে হিন্দু-বৌদ্ধ সকলে মগধেশ্বরী পূজা করতেন। যদিও মা মগধেশ্বরী বৌদ্ধ ছিলেন। তান্ত্রিক দেবী বলে হিন্দু-বৌদ্ধ সকলে মগধেশ্বরীর পূজা করতেন। আজকের দিনেও গ্রাম গঞ্জে পূর্বের মত বিভিন্ন গাছ-গাছালী দিয়ে জার পূজা করা হয়। এ পূজায় গাছ গাছালীতে আগুন দিয়ে ডাক ছেড়ে বলা হয়, "জাগরে জাগ, হক্কল ঘরর" 'টেয়া পয়সা আঁরঅ ঘরত জাগ।' এ পূজা এখনো চৈত্র-সংক্রান্তিতে কিছু কিছু বড়ুয়া পরিবারে রয়েছে। এক সময় ছিল যখন হিন্দুদের মত বড়ুয়া সমাজেও আশ্বিনে রান্না করা ভাত পানিতে ভিজিয়ে কার্ত্তিক মাসে উৎসব সহকারে খাওয়া হত। দেবতা অশ্বিনী পূজা নামে এ পান্তা ভাত খাওয়া হত। প্রচলিত শ্লোক ছিল-

"আশ্বিনে বাঁধি কার্ত্তিকে খায়,
যে বর মাগে- সে বর পায়।"

এভাবে প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির বহু প্রভাব বৌদ্ধ সমাজে পড়েছিল। বর্তমান ভারতেও বৌদ্ধ পরিবারে এখনও বিভিন্ন দেব-দেবীর ছবি বাসায় আছে এবং পূজিত হচ্ছে। শুধু বড়ুয়াদের মধ্যে নয়। চাকমা বৌদ্ধগণের মধ্যে এ সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে। প্রাত স্মরণীয় পরম শ্রদ্ধেয় সংঘরাজ সারমেধ মহাথেরোর ১৮৬৪ সালের দিকে সংস্কারে বর্তমানে সমাজে পরিবর্তন এসেছে। বলতে গেলে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরুত্থান হয়েছে ও হচ্ছে।

আধুনিক বড়ুয়া সমাজঃ

বাংলাদেশের বড়ুয়া সমাজে বিংশ শতকের সূচনা হতে দ্রুত পরিবর্তনশীলতা এসেছে। অধিকন্তু, শিক্ষা সংস্কৃতি ধর্ম ইত্যাদি ক্ষেত্রে একুশ শতকের সূচনালগ্নে হতে আরো সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে। বলতে গেলে প্রাচীন কুসংস্কার প্রায় চলে গেছে। সভ্যতার বিকাশ সমাজের সর্বক্ষেত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। আধুনিক বৌদ্ধ সমাজ শিক্ষা সাংস্কৃতিক তথা নতুন ডিজিটাল ব্যবসায় ক্রমে উন্নতির দিকে যাচ্ছে। বৌদ্ধদের সামাজিক দিক নির্দেশনাকারী বৌদ্ধ বিহারই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আজকাল প্রায় বৌদ্ধ বিহারের অবকাঠামো পাকা হচ্ছে এবং ভিক্ষু কেন্দ্রিক বৌদ্ধ সমাজের সার্বিক চিত্র পাল্টে যাচ্ছে। বিশেষ করে আধুনিক বড়ুয়া সমাজের ছেলেরা কোরিয়া, জাপান, ইটালী, ফ্রান্স, লন্ডন তথা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থান করে অর্থোপার্জনে সমাজের চিত্র পাল্টিয়ে ফেলেছে। ইহা বাঙ্গালী বৌদ্ধদের জন্য আর্শীবাদ। এছাড়া বড়ুয়া সমাজে শিক্ষার দীক্ষার দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। সরকারী বিভিন্ন উচ্চপদে ও ভার্সিটিসহ সর্বত্র উচ্চপদে আসীন হয়ে বড়ুয়াদের মুখ উজ্জ্বল করছে। যে গ্রামে এক সময় একজন এস.এস.সি পাশ ছিল না, এখন গ্রাজুয়েট ছাড়া কোন গ্রাম নেই বললে চলে। কম্পিউটার যুগ আসায় সমাজের উন্নয়নে বিশেষ প্রভাব পড়ছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ২০০৯ সালে বড়ুয়াদের মধ্যে আধুনিক যুগে সর্বপ্রথম একজন মন্ত্রী হন। তাঁর নাম বাবু দীলিপ বড়ুয়া, শিল্প মন্ত্রী। ইহা আমাদের গৌরব এবং এ জন্য বড়ুয়া সমাজ গর্বিত। ইতিহাসের পাতায় এ মন্ত্রী হবার বিষয়টি ভবিষ্যতে স্থান পাবে।

বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা, মহাস্থবির নিকায়ের ভিক্ষু মহাসভা, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি, বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ, বুদ্ধিষ্ট ফেডারেশন প্রমুখ বিবিধ সংগঠনের মাধ্যমে বর্তমান বৌদ্ধ সমাজ বিশ্বে পরিচিতি লাভ করছে। এ সমস্ত সংগঠন বৌদ্ধ সমাজের সার্বিক দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করছে এবং বিশ্বে বৌদ্ধ রাষ্ট্র সমূহের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনে বিশেষ অবদান রাখছে।

বিভিন্ন সংগঠনের বিষয় নিয়ে অনেকে নানা সমালোচনা ও নান মত প্রকাশ করেন। এ সমস্ত সংগঠন সমূহ আছে বলে প্রয়োজনে জাতীয়ভাবে প্রতিবাদ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। তাছাড়া, বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক সংগঠন, পার্বত্য, এলাকার বিভিন্ন উপকারে আসছে। সমালোচকগণ সমালোচনা করবেন। ইহা অতীতেও ছিল বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে। কিন্তু আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। আধুনিক ভিক্ষু সমাজ বড়ুয়া বৌদ্ধদের পথ প্রদর্শক। মহামান্য সংঘরাজ সারমেধ প্রকৃত থেরবাদ প্রচারে যেমন ভূমিকা রেখেছিলেন, তেমনি পরবর্তীতে সংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের বাংলাদেশী বৌদ্ধদের বিশ্বে পরিচয় প্রদানে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। পরবর্তীতে সংঘরাজ অভয়তিষ্য মহাথের সংঘরাজ শীলালংকার মহাথেরো, সংঘরাজ শাসনশ্রী মহাথের এবং বর্তমান সংঘরাজ শ্রীমৎ ধর্মসেন মহাথেরো বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজের আলোকবর্ত্তিকা রূপে বিরাজমান। সংঘ নায়ক এস ধর্মপাল মহাথেরো ও বাংলাদেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বাঙ্গালী বৌদ্ধদের পরিচিতি তুলে ধরে আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করতেছেন।

এছাড়াও রাউজানের কদলপুর ভিক্ষু-শ্রামণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ভিক্ষুর বিনয় ও ত্রিপিটক চর্চায় এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু সংখ্যা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। ২০০০ সালে কক্সবাজার জেলাধীন উখিয়া উপজেলাস্থ শৈলেরঢেবা গ্রামে শ্রীমৎ কুশলায়ন থেরো মহোদয় 'জ্ঞানসেন বৌদ্ধ ভিক্ষু-শ্রামণ প্রশিক্ষণ ও সাধনা কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠান হতে বহু ভিক্ষু বিনয় সম্মত শিক্ষা গ্রহণে সদ্ধর্ম প্রচার ও প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রাখছেন। এভাবে বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় চর্চার শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন শ্রদ্ধেয় স্মৃতি মিত্র ভন্তের খাগড়াছড়ির সাধনা কেন্দ্রের কথা বলা যায়। এরকম আরো প্রতিষ্ঠান বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে হচ্ছে। তবে সঠিক বিনয় চর্চা হচ্ছে কিনা এবং ধর্মীয় বিধান মতে কার্য্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা সময়ে জানা যাবে। তবে চর্চার ব্যবস্থা হচ্ছে এটা কম কথা নয়। কমলাপুরের ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার এবং রাউজান হোয়াড়া পাড়ার কমপ্লেক্স বৌদ্ধদের জন্য বিশাল আশ্রয় স্থান। বিগত দিনে শত শত বৌদ্ধ ছাত্র-ছাত্রী ঐ সমস্ত স্থান হতে শিক্ষা নিয়ে দেশে বিদেশে অবস্থান করে। নিজের উন্নতি ও সদ্ধর্মের প্রসারে ভূমিকা রেখেছেন। এভাবে বর্তমান চাকমা ও রাখাইন বৌদ্ধ বিহারেও কার্য্যক্রম চলতেছে। ইহা আমাদের জন্য শুভক্ষণ শুভমূহূর্ত।

অনেকে বলেন, আধুনিক বড়ুয়া সমাজ ধর্মে কর্মে অনেক পিছিয়ে। আমার ধারণা মতে আধুনিক বড়ুয়া সমাজ ধর্মে কর্মে শিক্ষা দীক্ষায় ব্যবসা বানিজ্যে অনেক এগিয়ে গেছেন এবং যাচ্ছেন। অতীতে কোন গ্রামে বছরে দুই একটা সংঘদান হত কিনা সন্দেহ। এখন

এমন কোন দিন নেই প্রতি গ্রামে একটা না একটা সংঘদান, অষ্টপরিষ্কার দান হচ্ছেনা। অতীতে কঠিন চীবর দান হত দু'একটা গ্রামে। এখন প্রায় সব বিহারেই কঠিন চীবর দান হচ্ছে। ভিক্ষুসংঘ নিমন্ত্রণ বা ফাং করতে এখন ২/৩ মাস আগেই প্রস্তুতি নিতে হয়। কেননা, সংঘ পাওয়া যায়না। উনাদের অন্যত্র নিমন্ত্রণ থাকে। এছাড়া ও দানীয় বস্তুর গুণগত মান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে পূর্বে ২/৩ হাজার টাকায় কঠিন চীবর দান করা হত সেখানে এখন লক্ষ লক্ষ টাকায় অনুষ্ঠান করা হয়। এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রকৃত সংঘকে শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে আধুনিক বড়ুয়াগণ অত্যান্ত শ্রদ্ধাভরে বিবিধ অনুষ্ঠান করে থাকেন। সুতরাং বলা যায় অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমান বড়ুয়া সমাজ অনেক উন্নত এবং ভবিষ্যতে আরো উন্নতি লাভ করবে।

আমাদের মত সাধারণ বড়ুয়া গণের কাম্য, সকল সংগঠন এবং ভিক্ষু সংগঠন সহ জাতীয় ভাবে প্রয়োজনীয় বিষয়ে, ঐক্য মত পোষণ করে কাজ করলে আমাদের আরো উন্নতি হবে। নিকায় সংগঠনের উর্দ্ধে উঠে জাতীয় জরুরী বিষয়ে ঐক্যমত হয়ে কাজ করতে পারলে বৈশালীদের মত আমাদের ভবিষ্যত অগ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি পাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ জন্য প্রয়োজন জাতীয় ভাবে একটি সংঘরাজ তহবিল গঠন। যার মাধ্যমে বিশেষ প্রয়োজনে বৌদ্ধদের উপকার করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বড়ুয়াগণ সাধারণত শান্ত দান্ত ও মৈত্রী পরায়ন। বুদ্ধের দেশিত পঞ্চশীল পালনে অনেকে সচেষ্ট থাকেন। অধিকন্তু, বড়ুয়াদের অন্যতম গুণ হচ্ছে সর্বস্থানে সকল মানুষের সাথে সহজে একাকার হয়ে যেতে পারেন। অর্থাৎ পরিবেশকে গ্রহণে যা করণীয় তা করে থাকেন। বাংলাদেশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী প্রধান রাষ্ট্র হলেও বড়ুয়া গণের সাথে গভীর সম্প্রীতি লক্ষ্যনীয়। ইহার অন্যতম কারণ হচ্ছে বড়ুয়াগণ এদেশের আদি অধিবাসী এবং বুদ্ধিমানেরা বুদ্ধের অহিংসা নীতির সাধক।

উপসংহার বলা যায়, বাঙ্গালী বড়ুয়া বৌদ্ধগণ মূলত এদেশের আদি অধিবাসী। এখন উত্তর বংগের যাদেরকে আদিবাসী বলা হয়, তাদের সাথে আমাদের প্রাচীন বড়ুয়া সমাজের সামাজিক অবস্থার প্রায় মিল ছিল। বৈশালীর বজ্জী বা মগধ হতে তাড়িত হয়ে এদেশে আসা বৌদ্ধগণের সাথে এখানকার আদিবাসীদের সাথে কোন বৈরীতার ইতিহাস পাওয়া যায় না। এদেশের প্রাচীনকালে বসবাসকারী বৌদ্ধরা কালের সংঘাতে হয়তো ধর্মত্যাগ করেছেন কিন্তু দেশ ত্যাগ করেননি। সুতরাং বিভিন্ন বৌদ্ধ রাজাদের আমলে উত্তর বঙ্গ, সমতট তথা চট্টগ্রামে বসবাসকারী বৌদ্ধগণ উপাধী পরিবর্তন করেছে। তাই বলা যায়, বড়ুয়াগণ এদেশের প্রাচীন অধিবাসী এবং বংশ পরম্পরায় রাজবংশের রক্তের সাথে সম্পর্কিত। পরিশেষে, বর্তমান সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার প্রাক্তন সভাপতি পরম শ্রদ্ধেয় সত্যপ্রিয় মহাথেরো মহোদয়ের ভাষায় বলা যায়, "বড়ুয়া মূলতঃ রাজবংশের বংশধর"।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থসূত্র ও তথ্যাবলীঃ

১। রাজমালা (১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দ) কালী প্রসন্ন সেন রচিত (প্রাচীন ত্রিপুরা রাজার ইতিহাস গ্রন্থ)।

২। চট্টগ্রামের প্রথম মানব ভূমি লেখক আলাদীন আলী ৩৭২ পৃষ্ঠা।

৩। সদ্ধর্মের পুনরুত্থান লেখক- ধর্মাধার মহাস্থবির (১৯৬৪) ২৩ পৃষ্ঠা।

৪। চট্টগ্রামের ইতিহাস লেখক- পূর্ণ চন্দ্র চৌধুরী ১২ পৃষ্ঠা।

৫। চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের ইতিহাস লেখক- ডা সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া (১৯৮১) ৪৬ পৃষ্ঠা।

৬। বাংলাদেশের বড়ুয়া জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য' লেখক বাবু সুনীতি রঞ্জন বড়ুয়া ১৭ পৃষ্ঠা।

৭। চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের ইতিহাস- লেখক বাবু নতুন চন্দ্র বড়ুয়া ৩৫ পৃষ্ঠা।

৮। বড়ুয়া জাতি- লেখক উমেশ চন্দ্র মুৎসদ্দি।

৯। পাক-ভারত উপমহাদেশে শতবর্ষে বৌদ্ধদের অবদান- প্রবন্ধ জগজ্যোতি- ডঃ বেণী মাধব বড়ুয়া ৪৬ পৃষ্ঠা।

১০। পটিয়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য- লেখক এস, এম, এ, কে জাহাঙ্গীর পৃষ্ঠা ১৩।

১১। বাংলাদেশের বৌদ্ধ সাহিত্য, ঐতিহ্য ও সমাজ জীবন- ডঃ প্রণব কুমার বড়ুয়া।

১২। সিং বা সিংহ উপাধীঃ প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের বিশেষ উপাধী বিশেষ পাঞ্জাব, রাজপুতনাবাসী, কুমিল্লা- নোয়াখালী অঞ্চলে বসবাসকারী বৌদ্ধদের উপাধী।

১৩। সমতট- কুমিল্লা ময়নামতী, শালবন এলেকা, পাহাড়পুর ইত্যাদি অঞ্চল।

১৪। হিউয়েন সাং চৈনিক পরিব্রাজক, ৬২৯-৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সমতট, পুন্ডবর্ধন, নালন্দা

ইত্যাদি স্থানে অবস্থান করে ইতিহাস লেখেন। এ সময় খগড় বংশীয় বাঙ্গালী বৌদ্ধদের রাজত্বের কথা তিনি লিখেছেন।

JNANASEN BUDDHIST BHIKKHU-SRAMAN TRAINING & MEDITATION CENTRE

ESTD : 2000